নারী কর্মক্ষেত্রেঃ তাঁরা কি সত্যিই হেরে যায়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলি?

লেখক: অনুভব রহমান | প্রকাশিত: 13 September 2026, 10:14 AM | বিভাগ: এইচআরএম

স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ নারীর অদেখা বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নেতৃত্বের অপ্রকাশিত গল্প

নারীর কর্মজীবনের অদৃশ্য যুদ্ধ

যে বাধাগুলো আমরা দেখি, আর যে বাধাগুলো দেখতে চাই না “সবচেয়ে কঠিন বাধাগুলো সবসময় নীতিমালায় লেখা থাকে না; সেগুলো লুকিয়ে থাকে দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রত্যাশায় এবং নীরব বিচারগুলোতে।”

প্রথম পর্বে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম নারীরা কি সত্যিই ক্যারিয়ার ছেড়ে দেয়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলি? বিশ বছরেরও বেশি সময়ের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতায় আমি একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে দেখেছি অধিকাংশ নারী একদিন হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দেন না। তাঁরা ধীরে ধীরে ক্লান্ত হন।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যান। ধীরে ধীরে নিজেদের সম্ভাবনাকে ছোট করতে শুরু করেন। আর এই প্রক্রিয়াটি এতটাই নীরব যে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান, পরিবার, এমনকি সেই নারী নিজেও বুঝতে পারেন না ঠিক কোথায়, কীভাবে পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল। আমরা সাধারণত নারীর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করি তখন, যখন কেউ চাকরি ছেড়ে দেন, পদত্যাগ করেন বা দৃশ্যমানভাবে পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু প্রকৃত গল্পটি অনেক আগে শুরু হয়। সেই গল্প শুরু হয় প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা থেকে। কখনো একটি মন্তব্য। কখনো পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সন্দেহ বা অস্বস্তি। কখনো একটি সিদ্ধান্ত। কখনো একটি সুযোগ না পাওয়া। কখনো একটি নীরব প্রত্যাশা। আর ধীরে ধীরে সেই অভিজ্ঞতাগুলো মিলে একজন নারীর আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্যারিয়ারের গতিপথকে বদলে দিতে শুরু করে।

আমার কাজের ধরনের কারণে আরেকটি বিষয় আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি আমরা প্রায়ই নারীদের জিজ্ঞেস করি, “তাঁরা কেন এগোতে পারছে না?” কিন্তু খুব কমই নিজেদের জিজ্ঞেস করি “আমরা কি সত্যিই এমন কর্মপরিবেশ তৈরি করেছি, যেখানে তাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে?” কারণ সব বাধা চোখে দেখা যায় না। কিছু বাধা থাকে আচরণে। কিছু থাকে মূল্যায়নের পদ্ধতিতে। কিছু থাকে সুযোগ বণ্টনের ধরনে। কিছু থাকে নীরব প্রত্যাশায়। আর কিছু থাকে সেই মানসিকতায়, যেটিকে আমরা এতটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি যে সেটিকে আর বাধা বলেই মনে হয় না। সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো এই বাধাগুলোর অধিকাংশই ইচ্ছাকৃত নয়। কেউ সচেতনভাবে কাউকে পিছিয়ে দিতে চায় না। তবুও প্রতিদিনের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত, মন্তব্য, প্রত্যাশা এবং অদৃশ্য পক্ষপাত একসময় এমন একটি বাস্তবতা তৈরি করে, যেখানে একজন নারীকে একই জায়গায় পৌঁছাতে অনেক বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়। আর সেই কারণেই নারীর কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধগুলো প্রায়ই দৃশ্যমান নয়। সেগুলো নীরব। কিন্তু তার প্রভাব গভীর।

সাধারণত আমরা দৃশ্যমান চ্যালেঞ্জ নিয়েই বেশি কথা বলি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারী কর্মীদের কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি আলোচনা হয়। যেমন নিরাপত্তা, যাতায়াত ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, বেতন বৈষম্য কিংবা নেতৃত্বে কম প্রতিনিধিত্বের মতো বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিঃসন্দেহে এসব সমস্যা নিয়ে কথা হওয়া প্রয়োজন। কারণ এগুলো বাস্তব। এগুলো পরিমাপ করা যায়। এগুলোর প্রভাব দৃশ্যমান। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় এগুলো পুরো গল্প নয়। কারণ সবচেয়ে বড় ক্ষত অনেক সময় সেখানে তৈরি হয়, যেখানে কোনো অভিযোগপত্র লেখা যায় না। কোনো এইচআর রিপোর্ট সেটি দেখায় না। কোনো এ্যামপ্লয়ী সার্ভে সেটি পুরোপুরি ধরতে পারে না। তবুও সেই অদৃশ্য ক্ষতই একজন নারীর আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পেশাগত পরিচয়কে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। অনেক সময় একটি মন্তব্য, একটি অনুমান, একটি উপেক্ষা কিংবা একটি অদৃশ্য প্রত্যাশা এমন প্রভাব ফেলে, যা কোনো নীতিমালা ভঙ্গ করে না কিন্তু ধীরে ধীরে একজন মানুষের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। আর ঠিক সেই কারণেই নারীর কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোর অনেকগুলো চোখে দেখা যায় না। তবুও সেগুলোর প্রভাব

দীর্ঘস্থায়ী। এবং অনেকে ক্ষেত্রে সেগুলোই নির্ধারণ করে দেয় কে নেতৃত্বের পথে এগিয়ে যাবে, আর কে মাঝপথে থেমে যাবে।

“নিজেকে প্রমাণ করো” কিন্তু কতবার?

কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় বৈপরীত্যগুলোর একটি হলো তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন সবসময় সরাসরি করা হয় না। অনেক সময় সেই প্রশ্নগুলো লুকিয়ে থাকে দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে, প্রত্যাশার ভেতরে এবং মূল্যায়নের ভেতরে। ফলে একজন নারীকে শুধু ভালো কাজ করলেই হয় না; অনেক সময় তাঁকে বারবার প্রমাণ করতে হয় যে তিনি সত্যিই সেই কাজের যোগ্য। একজন পুরুষ কর্মী ভালো কাজ করলে আমরা প্রায়ই ধরে নিই তিনি সক্ষম। কিন্তু একজন নারী কর্মী একই ধরনের সাফল্য অর্জন করলে অনেক সময় মন্তব্য আসে “সে সত্যিই এক্সেপশনাল।” প্রথম শুনতে এটি প্রশংসা মনে হতে পারে। কিন্তু এর ভেতরে একটি সূক্ষ্ম বার্তা লুকিয়ে থাকে। যেন অসাধারণ হওয়াটাই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল না। ফলে অনেক নারীর কর্মজীবন এক ধরনের অবিরাম প্রমাণের চক্রে পরিণত হয়। নতুন দায়িত্ব? নিজেকে প্রমাণ করো। নেতৃত্বের সুযোগ? নিজেকে প্রমাণ করো। কঠিন প্রকল্প? নিজেকে প্রমাণ করো। নতুন প্রতিষ্ঠান? নিজেকে প্রমাণ করো। মাতৃত্বের পর কাজে ফিরেছে? আবার নিজেকে প্রমাণ করো।

আমি বহু নারীকে দেখেছি, যাঁরা বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ কাজ করছেন। তাঁদের সাফল্য দৃশ্যমান। তাঁদের অবদান পরিমাপযোগ্য। তাঁদের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। তবুও তাঁদের অনেকের মনে হয়েছে “আমাকে এখনও নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।” এই মানসিক ক্লান্তির কোনো কেপিআই নেই। কোনো পারফরম্যান্স ড্যাসবোর্ড এটি দেখায় না। কোনো কোয়ার্টারলি রিভিউ এটি পরিমাপ করে না। তবুও এই অদৃশ্য চাপই ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ক্ষয় করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ছোট করে এবং অনেক সম্ভাবনাময় মানুষকে নেতৃত্বের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এই ক্ষয়টা একদিনে ঘটে না। এটি ঘটে ধীরে ধীরে। নীরবে। কিন্তু তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

একই আচরণ, ভিন্ন বিচার, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

করপোরেট বিশ্ব নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই চেষ্টাও থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা সবাই মানুষ। আর মানুষের সিদ্ধান্ত সবসময় শতভাগ পক্ষপাতমুক্ত হয় না। ফলে অনেক সময় একই আচরণ, একই সিদ্ধান্ত কিংবা একই ধরনের নেতৃত্বগুণ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয়। একজন পুরুষ দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করলে বলা হয় “স্ট্রং লিডার।” একজন নারী একই দৃঢ়তা দেখালে বলা হয় “ঠু অ্যাগ্রেসিভ।” একজন পুরুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে বলা হয় “ক্যারিয়ার ফোকাসড।”একজন নারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে বলা হয় “ ঠু অ্যাম্বিশাস।” একজন পুরুষ নিজের সাফল্যের কথা বললে বলা হয় “ কনফিডেন্ট।” একজন নারী একই কাজ করলে কখনো কখনো বলা হয় “সেলফ-প্রমোশনাল।” এই বিচারগুলো সাধারণত ইচ্ছাকৃত হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো আমাদের

অচেতন ধারণা, সামাজিক অভ্যাস এবং দীর্ঘদিনের মানসিক কাঠামো থেকে আসে। কিন্তু প্রভাবের দিক থেকে এগুলো মোটেও ছোট নয়। কারণ একজন মানুষ যখন বারবার অনুভব করেন যে তাঁর আচরণ অন্যদের তুলনায় ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করতে শুরু করেন। তিনি কম কথা বলেন। কম দৃশ্যমান হন। কম ঝুঁকি নেন। কম দাবি করেন। আর অনেক সময় অজান্তেই নিজের সম্ভাবনাকেও ছোট করে ফেলেন। ফলাফলটি হয় অত্যন্ত নীরব। কেউ তাঁকে থামিয়ে দেয় না। কেউ তাঁকে বলে না যে তিনি পারবেন না। তবুও একসময় তিনি সেই সুযোগগুলো থেকে দূরে সরে যান, যেগুলো একদিন তাঁর নাগালের মধ্যেই ছিল। আর ঠিক সেখানেই আমরা বুঝতে পারি কখনো কখনো সবচেয়ে বড় বাধাগুলো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু তাদের প্রভাব অত্যন্ত বাস্তব।

(চলবে)

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।